Vol. 54 | No. 1 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মীর মশাররফ হোসেন : সমন্বয়ধর্মী জীবনবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা

Volume	54
Issue	1
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মো. আব্দুল আলীম
Published online	October 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v54i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i1.2
Pages	১১-২৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৪ ॥ সংখ্যা : ১ ॥ অক্টোবর ২০১৬

Check for updates

মীর মশাররফ হোসেন : সমন্বয়ধর্মী জীবনবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা

মো. আব্দুল আলীম*

সারসংক্ষেপ : মীর মশাররফ হোসেনের সৃজন ও মননশীলতার মৌল বৈশিষ্ট্য সমন্বয়ধর্মী জীবনবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা। যুগজীবন ও পারিপার্শ্বিক নানা অভিঘাতে বিভ্রান্ত হয়ে শেষ জীবনে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার কাছে আত্মসমর্পণ করলেও তাঁর অধিকাংশ রচনার মর্মমূলে প্রবাহিত হয়েছে অসাম্প্রদায়িক, উদার ও সমন্বয়ধর্মী জীবনাদর্শ। এ প্রবন্ধে বাঙালি-সমাজে অসাম্প্রদায়িক ও সমন্বয়ধর্মী চিন্তার বিকাশ, মীর মশাররফ হোসেনের মানস-গঠনে তার প্রভাব এবং তাঁর সৃষ্টিকর্মে এর প্রতিফলন সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১. ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) এক শক্তিমান গদ্যশিল্পী। মুক্তচিন্তা, উদারতা, সমাজ-সচেতনতা এবং অসাম্প্রদায়িকতা তাঁর জীবন ও সাহিত্যে সমানভাবে প্রতিফলিত। মুসলমান সমাজ যখন আধুনিক জীবনভাবনা থেকে মুখ ফিরিয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামিপূর্ণ চিন্তা-চেতনায় গভীরভাবে আচ্ছন্ন ছিল, তখন মীর মশাররফ হোসেন গতানুগতিকতার বেড়াজাল ছিন্ন করে বের হয়ে আসেন। বিচিত্র বিষয় ও আঙ্গিকের সাহিত্য এবং প্রাঞ্জল গদ্যশৈলী নির্মাণ করে তিনি চমকে দেন সেকালের বিদ্বৎ-সমাজকে। *বঙ্গদর্শন*, *চারুবার্তা*, *বসুধা* প্রভৃতি পত্রিকা তাঁর ভাষারীতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। জমিদারপুত্র মশাররফ হোসেন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সেকালের সামন্তজীবনের সদর-অন্দর। দেশ-কালের বহুমাত্রিক অভিঘাত তাঁর শিল্পীমানসকে করেছে প্রভাবিত। ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস, মান-অভিমান, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিরোধ এবং মিলেমিশে বসবাস করার বিষয়টি তিনি গভীরভাবে অবলোকন করেছেন। তিনি

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

এও অনুধাবন করেছেন যে, এদেশের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় এবং সামাজিক আচার-বিশ্বাস ও সংস্কারগত নানা বিরোধ থাকলেও তাদের মর্মমূলে প্রধানত সমন্বয়ধর্মী-অসাম্প্রদায়িক চিন্তার ফল্গুধারা প্রবাহিত। বাঙালি চরিত্রের এই চিরায়ত বৈশিষ্ট্য মীর মশাররফ হোসেন ধাতস্থ করেছিলেন। অনেক সময় সমকালীন 'অনুদার' পরিবেশের প্রভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ ঘটালেও, 'সামগ্রিকভাবে তিনি ছিলেন সমন্বয়ধর্মী-অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক-বাহক।' (মনসুরউদ্দীন, ১৩৭১ : ৬৭) মশাররফ-মানস এবং তাঁর সৃষ্টিকর্মে এই সমন্বয়ধর্মী ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তার বিশ্লেষণই এ প্রবন্ধের মূল উপজীব্য।

২. বাঙালির সমাজ-সাহিত্যে সমন্বয়ধর্মী জীবনবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা

বাঙালির জীবন, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল প্রবণতা সমন্বয়ধর্মিতা ; সংঘাত এবং বিরোধের ভাবটি এখানে গৌণ। বিভিন্ন সময় এ অঞ্চলে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মানুষের আগমনের ফলে বাঙালির জীবন, সমাজ এবং সংস্কৃতিতে নানা পরিবর্তন ও বাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করলেও, তাতে ঐক্যের ভাবটি বিনষ্ট হয়নি। এ প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন :

> পারশীক, গ্রীক, পহলব, শক, কুষাণ, হুন, তুর্কী, আফগান, মোগল, ইংরেজ ক্রমান্বয়ে ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে বটে, কিন্তু কেহই ইহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ ভারতের সুদূর আধ্যাত্মিক আদর্শ। এই আধ্যাত্মিক আদর্শ বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যই ভারতের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে এবং বহু বিচিত্র বাহ্য রূপের মধ্যেও ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে।(উপেন্দ্রনাথ, ১৪০৮ : ১৩৩)

যুগে যুগে এদেশের মানুষ নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির উদারনৈতিক ভাবধারার সংস্পর্শ লাভ করেছে। সনাতন ধর্মের সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যবাদ, বৌদ্ধধর্মের উদার ও অহিংসরূপ, নাথ ও বৈষ্ণবধর্মের সহিষ্ণুতা ও ভক্তিবাদ এবং ইসলামধর্মের সাম্য ও মানবতাবাদ সামগ্রিকভাবে তাদের চেতনায় উদারতা, মিলন ও সম্প্রীতির বীজ বপন করেছে। শ্রীচৈতন্য দেব বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমে দ্বিধাবিভক্ত হিন্দুসমাজে প্রেম-ভক্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত করে এখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতির ভুবন প্রেমরসে সিক্ত করেন। আহমদ শরীফ লিখেছেন : 'ঈর্ষা-অসূয়া-ক্রুরতা-সংকীর্ণতাদুষ্ট বাঙালী চৈতন্য প্রভাবে মানবতার সুউচ্চ স্তরে উন্নীত হলো।' (শরীফ, ২০০৮ : ৩৩) বঙ্গে মুসলিম বিজয়ের পর ইসলামের সাম্যের বাণী প্রচারে এগিয়ে আসেন সুফি, দরবেশ ও পির-আউলিয়াগণ। এ অঞ্চলে ইসলামধর্ম প্রসারের প্রধান কারণ শক্তি নয় ভক্তি। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *ভগবদ্গীতা* প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়, এর ফলে সাধারণ মানুষের ধর্মবোধ পরিশীলিত হয়। শাসকদের অনেকেই ছিলেন উদার ও সমন্বয়ী চিন্তার ধারক-বাহক। মধ্যযুগের সাধকগণ – বিশেষ করে রামানন্দ, কবীর, দাদু, নানক ও

চৈতন্যদেব সমন্বয়ধর্মী চেতনা বিস্তার করেছেন। সম্রাট আকবর প্রবর্তিত *দীন-ই-ইলাহী* ধর্ম ভারতীয় সমাজে উদার ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে শক্তিশালী করেছে। সকল ধর্মের সারকথা নিয়েই তিনি এ ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। সম্রাট বাবরের চিন্তা-কর্মেও উদার-মানবতার প্রকাশ ঘটেছে। পুত্র হুমায়ুনকে তিনি যে গোপনীয় নিদের্শনামা দিয়েছিলেন, তা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ঋদ্ধ :

> তোমার মনকে ধর্মীয় সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হতে দেবে না এবং সকল শ্রেণীর মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি ও ধর্মীয় আচারাদির প্রতি লক্ষ রেখে সকলের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করবে। বিশেষ করে গো হত্যা থেকে বিরত থেকো, এর ফলে ভারতের জনগণের হৃদয়ে তুমি স্থান নিতে পারবে। এর দ্বারা তোমার সঙ্গে এদেশের মানুষ কৃতজ্ঞতার রজ্জুতে আবদ্ধ হবে। তুমি কখনো কোনো সম্প্রদায়ের উপাসনালয় ধ্বংস করবে না এবং সবসময় ন্যায়বিচারের প্রতি অনুরক্ত থাকবে, যাতে রাজার সঙ্গে প্রজাদের সুসম্পর্ক বজায় থাকে এবং ভুখণ্ডে শান্তি ও সন্তুষ্টি বজায় থাকে। (সালাহ্উদ্দীন, ২০১৩ : ১১৪)

সম্রাট শাহজাহান এবং তাঁর পুত্র দারাশিকো ছিলেন সমন্বয়ধর্মী চিন্তার প্রাণপুরুষ। দারা সুফিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সকল ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করতেন। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগে বাঙালি জীবনের সঙ্গে মরমি ভাবধারার সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। পারস্য কবি শেখ সাদী, হাফিজ এবং দার্শনিক জালালুদ্দিন রুমীর প্রভাবের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, জীবনী-সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য এবং মৌলিক রচনায় সমাজ-সচেতনতা, মানবীয় বোধ ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রকাশ ঘটে। সবার উপরে মানুষ সত্য – মানবতার এই অমোঘ মন্ত্রও মধ্যযুগের কবিদের কণ্ঠে শোনা যায়।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙালি সমাজে যে সমন্বয়বাদী ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রসার ঘটে, তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় সৈয়দ সুলতান, শেখ পরান, শাহ মোহাম্মদ সগীর, আবদুল হাকিম, আলাওল প্রমুখের রচনায়। আবদুল হাকিমের *নূরনামা* কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ধর্মী ধারার কথা এসেছে কবির অসাম্প্রদায়িক ভাবনা থেকে। আঠার শতকে বাঙালির ভাবজগতে নতুন চিন্তার স্ফুরণ ঘটান শাহ ওয়ালীউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬৩) এবং রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। এ সময় বাংলার পল্লি অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজে বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। বাঙালির সমন্বয়ধর্মী ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা-জগতে বাউলদের অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাউল সম্রাট লালন এক্ষেত্রে অগ্রণী পুরুষ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ – সকল কিছুর ঊর্ধ্বে তিনি মানবতাকে স্থান দেন। অসাম্প্রদায়িক চেতনার সিদ্ধ-পুরুষ লালন উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন : 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।/লালন কয়, জেতের কি রূপ, দেখলাম না এ নজরে ॥' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪০৮ : ৬৪২) এছাড়া বিভিন্ন লোককবির গান এবং লোকসাহিত্যের নানা শাখায়

অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে অনিবার্যভাবে। এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> এই সকল পালাগানের শ্রোতা হিন্দু-মুসলমান উভয়েই। হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির উপর যে দেবতা হাসিয়া খেলিয়া ফুলশর সন্ধান করিয়া থাকেন, তিনি হিন্দুর পরিকল্পিত হইলেও আদতেই জাতিভেদ স্বীকার করেন না। এই গাথাগুলিতে জাতীয় বিদ্বেষের কণিকামাত্র নেই, সত্য ঘটনা স্বকীয় গৌরবের বেদীর উপর দাঁড়াইয়া শ্রোতার অনুরাগ আকর্ষণ করিতেছে। হিন্দু ও মুসলমান যে বহু শতাব্দীকাল পরস্পরের সহিত প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিলেন, এই গীতিকাগুলিতে তার অকাট্য প্রমাণ আছে। (দীনেশচন্দ্র, ১৯৯৬ : ১৪)

আধুনিক যুগে ইউরোপীয় প্রভাবে বাঙালি সমাজ জেগে ওঠে, যাকে অভিহিত করা হয়েছে *বাংলার রেনেসাঁস* নামে। পাশ্চাত্য প্রভাব আর আধুনিক জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি সমাজে ইহজাগতিকতা, মানবতাবাদ, উদারতা এবং অসাম্প্রদায়িক ভাবধারার প্রসার ঘটান রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, স্বামী বিবেকানন্দ, স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী, নওবাব আবদুল লতিফ প্রমুখ মনীষী। এঁরা হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজে নানাবিধ সংস্কার সাধন করে প্রগতিশীল ও সমন্বয়ধর্মী চিন্তার বিস্তার ঘটান। একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন ও সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেন। তিনি আধুনিক যুক্তিবাদী চিন্তা দ্বারা ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনের মর্মমূলে কুঠারাঘাত হানেন। নারীশিক্ষা বিস্তার, বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বাল্যবিবাহ রোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালি সমাজকে এগিয়ে দেন কয়েক ধাপ। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব প্রচার করেন, যত মত তত পথ। জীবে দয়া এবং ঈশ্বরে ভক্তির মাঝেই তিনি মুক্তির সন্ধান দেন। বিবেকানন্দ প্রচার করেন সর্বজীবে দয়া আর বৈরাগ্যের বাণী। সৈয়দ আহমদ, আমীর আলী এবং নওয়াব আবদুল লতিফ গোঁড়ামিপূর্ণ, পশ্চাৎপদ, অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত মুসলিম সমাজে আধুনিকতা, উদারতা এবং যুক্তিবাদের প্রসার ঘটিয়ে তাদের জাগিয়ে তোলেন। এছাড়া ডিরোজিওর মতো ইউরোপীয় মনীষীরা আধুনিক ও উদার চিন্তার প্রসার ঘটিয়ে বাঙালি সমাজকে এগিয়ে দেন।

দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আসা বিভিন্ন মত ও চিন্তাধারা একীভূত হয়েছিল বাঙালি জীবন ও সমাজে – এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল ইসলাম ধর্ম। বিরোধ কিংবা উগ্রতা নয়, বরং উদারতা ও সমন্বিত রূপেই ইসলাম বাঙালির চিত্তজগতে প্রোথিত হয়েছিল। সমালোচক লিখেছেন :

> শক-হূন-মোগল-পাঠানকে এক দেহে লীন করার মতো অসাধারণ সমন্বয়ী ক্ষমতাও ছিলো ভারতবর্ষের মাটিতে প্রোথিত। সর্বোপরি, প্রান্তবর্তী বঙ্গদেশে এসে বৈদিক,

> বৌদ্ধ এবং ইসলাম ধর্ম মূল থেকে আরও দূরে সরে গিয়েছিলো। এই সব মিলে বঙ্গদেশে জন্ম নিয়েছিলো এক সমন্বয়ী ইসলাম। (মুরশিদ, ২০০৮ : ১৪৫)

আধুনিক যুগে ইউরোপীয় প্রভাবে বাঙালির সমাজ-সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী চেতনার ধারা সমুজ্জ্বল হলেও, আদিকাল থেকেই এ অঞ্চলের মানুষ একটি উদার-সমন্বয়ধর্মী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করে আসছে। এ প্রসঙ্গে একজন গবেষক বলেছেন : 'এখানকার সাধারণ মানুষ একই পেশা, একই জীবনযাত্রা, একই ভাষা, একই বিশ্বাস-প্রথার উত্তরাধিকার একত্রে বহন করে।' (স্বরোচিষ, ২০১০ : ২৮) সমন্বিত জীবন-যাপনই তাদের মূল প্রবণতা। এখানকার হিন্দু-মুসলমান একই দেবতাকে সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর বলে মনে করে। "বঙ্গের বাউল-সাধকদের সাধনায় 'কোরান ও পুরাণ' একাকার হয়ে গেছে।" (স্বরোচিষ, ২০১০, ২৮) যুগ যুগ ধরে বাঙালি সমাজ ও বাংলা সাহিত্যে বহমান এই অসাম্প্রদায়িক, সমন্বয়ধর্মী, উদার এবং মানবতাবাদী চেতনাধারার ঐতিহ্যের সঙ্গে মীর মশাররফ হোসেন নিজেকে যুক্ত করেছিলেন অনিবার্যভাবে।

৩. মীর মশাররফ হোসেনের মানস-গঠন : পরিবার-সমাজ-দেশ-কাল ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব

মীর মশাররফ হোসেন আবির্ভূত হন ভারতবর্ষের এক যুগান্তরের কালে। ভারতবাসীর জীবনে ইংরেজ শাসন তখন জেঁকে বসেছিল। রাজ্যহারা মুসলমান-সমাজ তখন হতাশার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত, অন্যদিকে হিন্দুসমাজ ইউরোপীয় রেনেসাঁসের আলো আর ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় উজ্জীবিত। মধ্যযুগের ভাবধারা ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে আধুনিকতার মশাল উজ্জ্বল আভায় দীপ্তি ছড়াতে শুরু করেছে। এমনই যুগ-পরিবেশে বিত্তশালী জমিদার-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর পিতা মোয়াজ্জেম হোসেন যেমন উদার চিত্তের মানুষ ছিলেন, তেমনি ছিলেন সমকালীন অন্য জমিদারদের মতো সময়ের স্রোতে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে গা ভাসিয়ে দেওয়া একজন মানুষ। আত্মজীবনীমূলক রচনায় মীর মশাররফ হোসেন তাঁর পরিবার, দেশ-কাল এবং পারিপার্শ্বিক জীবনের চালচিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি শৈশব কাটিয়েছেন এক রক্ষণশীল, সংস্কারাচ্ছন্ন এবং আধুনিকতার দোলাচলে দোদুল্যমান পারিবারিক বৃত্তে। সে-পরিবারে শিশুর জন্মের সময় ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব, জিন-পরি তাড়ানোর জন্য সাতবার আজান দেওয়া হতো। শিশুর ভাগ্যনিয়ন্তা শক্তির আধার হিসেবে শিয়রে রাখা হতো কাগজ, কলম, কালির দোয়াত, তাস, পাশা, দাবা, লাঠি, সড়কি, তরবারি প্রভৃতি। তিনি যে পাঠশালায় লেখাপড়া শুরু করেন, সেখানে শিশুদের কপালের নিচে কলম রেখে মাথা উপুড় করে দেব-দেবীর স্তুতিবাচক ছড়া শেখানো হতো। তাঁদের পরিবারের অন্দরমহল এতটাই রক্ষণশীলতার আবরণে আচ্ছাদিত ছিল যে, সেখানে ইংরেজি শিক্ষার আলো-বাতাস প্রবেশের সুযোগ ছিল

না; বরং ইংরেজি শিক্ষাকে মনে করা হতো পাপ। মনে করা হতো, ইংরেজি শিখলে মৃত্যুর সময় আল্লাহ-রসুলের নাম মুখে না এসে 'গিডীমিডী' করে মরতে হবে ; বলা হতো ইংরেজি শেখা মানুষ মদ খায়, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে, হালাল-হারাম ও পাক-নাপাক জ্ঞান করে না। সে পরিবারের লোকদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, ইংরেজি শিখলে মানুষ ছোটখাটো শয়তানে পরিণত হয়। মূলত, এক ধরনের রক্ষণশীল আবহাওয়ায় অতিবাহিত হয়েছে মীর মশাররফ হোসেনের শৈশব-কৈশোর।

রক্ষণশীল পরিবারের কর্তা হলেও, মীর মোয়াজ্জেম হোসেন পুত্র মীর মশাররফ হোসেনকে ছোটবেলা থেকেই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শিক্ষার দ্বারা আলোকিত করেছেন। একদিকে মুন্সী জমির উদ্দীন তাঁকে শিখিয়েছিলেন ইসলামধর্মের নানা তত্ত্বকথা এবং আরবি-ফার্সির প্রাথমিক পাঠ, অন্যদিকে জগমোহন নন্দীর পাঠশালা থেকে তিনি শিখেছিলেন স্বরস্বতীর বন্দনা ও বাংলা ভাষার মৌলিক বিষয়াদির সাধারণ পঠন-পাঠন। এরপর কুষ্টিয়ার ইংরেজি-বাংলা স্কুল, পদমদীর নবাব স্কুল এবং কৃষ্ণনগরের কলেজিয়েট স্কুলের পাঠগ্রহণ তাঁর চিন্তার জগৎকে আমূল পাল্টে দেয়। বিশেষ করে, কৃষ্ণনগরে বসবাস তাঁর চেতনাকে নবরূপ দান করে। তখনকার কৃষ্ণনগরের সমাজ ছিল পুরোটাই হিন্দুধর্মাচার দ্বারা প্রভাবিত। ঐ সমাজ মশাররফের রক্ষণশীল মনের উপর নানা চাল-চলনের 'আধিপত্য' করে। সেখানে গিয়ে হিন্দুসমাজের আচার-আচরণ তিনি পূর্ণমাত্রায় আত্মস্থ করতে লাগলেন ; পাজামা, চাপকান ও টুপি ছেড়ে ধরলেন ধুতি, চাদর এবং উড়নি। কেবল পোশাক-পরিচ্ছদে নয়, চেতনাগতভাবেও তিনি হয়ে উঠলেন অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। পরবর্তী সময়ে সাহিত্য ও জীবনাচারে এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। বস্তুত, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক পরিসরে রক্ষণশীলতা এবং উদারতার সম্মিলনে গড়ে উঠেছিল মশাররফ-মানস। এ সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন :

> ভিন্ন প্রকৃতির এই দুই বিদ্যা মীরমানসে কোনো অসঙ্গতির বীজ বপন করেনি, দুটিকে একাধারে গ্রহণ করে শৈশব-কৈশোরেই তিনি পেয়েছিলেন অসাম্প্রদায়িকতার বীজমন্ত্র। এভাবেই রক্ষণশীলতা আর কূপমণ্ডূক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠলেও উত্তরকালে তিনি উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন সদর্থক জীবনচেতনায়। (বিশ্বজিৎ, ২০০২ : ২৮)

দেশ-কাল ও যুগের প্রভাবে তাঁর মানসলোক হয়ে উঠেছিল বিরোধপূর্ণ। একই সঙ্গে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের ভাবধারা তাঁর চেতনায় ঠাঁই পেয়েছিল। 'তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্বে যুগপৎ ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজ ও উন্মেষযুগের মধ্যশ্রেণির আচরণ-রুচি-প্রবণতা-বিশ্বাস প্রতিফলিত।' (আহসান, ২০১৬) মীর-মানসের এই প্রবণতা সম্পর্কে মুনীর চৌধুরীর অভিমত :

> বিপরীতধর্মী সরলতা ও জটিলতা, গতানুগতিকতা ও মৌলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ধার্মিকতা, গ্রাম্যতা ও নাগরিকতা, মধ্যযুগীয়তা ও আধুনিকতা সকলই মীরের

> স্বভাবজ। বিগত কালের রসবোধ ও জীবনচেতনার যে প্রকাশ পুঁথি সাহিত্যে লক্ষ্য করি, মীর-মানস তার সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেনি। (মুনীর, ২০১৪ : ২১)

মীর মশাররফ হোসেনের সমকালে ভারতবর্ষে জমিদার-নীলকরদের অত্যাচারে জনমানুষের জীবন বিপন্ন ছিল। জমিদার-পরিবারে জন্মগ্রহণ এবং কর্মসূত্রে জমিদারজীবনের নানা দিক তিনি খুব কাছে থেকে দেখার ফলে সামন্তজীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গ তাঁর চিন্তা-চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের পাশাপাশি নানা ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনে তাঁর সমকাল ছিল ঝঞ্ঝাপূর্ণ। হাজি শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের ঢেউ তখনও থামেনি, ওয়াহাবিদের রক্ষণশীলতার বিপরীতে জামালউদ্দিন আফগানির (১৮৩৮-১৮৯৭) প্যান ইসলামবাদ মুসলমানদের চেতনা-জগতে প্রভাব বিস্তার করেছে। সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭), নীলবিদ্রোহ (১৮৬০), মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা (১৮৬৩), কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭৩), ইন্ডিয়ান লীগ প্রতিষ্ঠা (১৮৭৫), ভারত সভা প্রতিষ্ঠা (১৮৭৬), কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫), মহা হিন্দু সমিতি প্রতিষ্ঠা (১৮৮৭), হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব – এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে মীর-মানসকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তুই প্রমাণ করে 'তৎকালীন সমাজ জীবনের নানা বিচ্ছিন্ন ও সংঘবদ্ধ আলোড়নের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ খুবই প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ছিল।' (মুনীর, ২০১৪ : ৩৭) সমকালীন বিভিন্ন সাহিত্যপ্রতিষ্ঠান, মতনির্ভর দলের সঙ্গে তাঁর সংযোগ নিরবচ্ছিন্ন না থাকলেও সেগুলোর ব্যাপারে তিনি 'উদাসীন বা নির্লিপ্ত' (মুনীর, ২০১৪ : ৩৭) ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন : 'জগৎ, জীবন, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যে অগভীর, তা নয়। মানবজীবনের জটিলতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও যথেষ্ট।' (ওদুদ, ১৩৫৮ : ১২৪) তাঁর জীবন এবং সাহিত্যের সঙ্গে সেকালের বাঙালির জীবন-ভাবনা, চিন্তা-চেতনা গভীর সংযোগসূত্রে আবদ্ধ ছিল। মূলত, 'তাঁর রচনার বিষয়-বৈচিত্র্য, প্রকাশ-নৈপুণ্য, সমাজমনস্কতা, মুক্তমন, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও অকপট স্বীকারোক্তি তাঁকে শিল্পী হিসেবে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।' (আহসান, ২০১৬)

৪. মশাররফ-সাহিত্যে সমন্বয়ধর্মী জীবনবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা

মীর মশাররফ হোসেনের সৃষ্টিকর্ম সংখ্যা-প্রাচুর্য এবং বিষয়-বৈভবে বিপুল ; সেযুগের একজন মুসলিম লেখকের জন্য যা ছিল অত্যন্ত শ্লাঘার। এই যে বিপুল সৃষ্টি-সম্ভার – তাতে ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম, দেশ-কাল এবং চিরায়ত মানবের জীবনাভিব্যক্তি ভাষারূপ পেয়েছে। জীবনের সংকীর্ণ কানাগলি থেকে মহাজীবনের মহাসড়কের চিহ্ন এতে দুর্লক্ষ নয়। তাঁর সকল সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে উদার, অসাম্প্রদায়িক এবং সমন্বয়ধর্মী চিন্তার সুর প্রাধান্য পেয়েছে। যুগ-পরিবেশের সাময়িক প্রভাব এবং শেষজীবনে প্রতিভার নিষ্প্রভ আলোয় সাম্প্রদায়িকতার ক্ষীণ আভা বিচ্ছুরিত হলেও,

সামগ্রিকভাবে তাঁর সৃষ্টিকর্ম অসাম্প্রদায়িকতার ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান। সেযুগের অন্যান্য মুসলমান লেখকের মতো তাঁর সাহিত্য সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় আচ্ছন্ন নয়। সাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং চরিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি উদার ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

মীর মশাররফ হোসেনের ভাষারীতি সর্বজনীন। তৎসম শব্দবহুল সাধুরীতির সুললিত গদ্য সৃষ্টি করে তিনি সমকালে নন্দিত হয়েছেন। তাঁর রচনাকর্ম হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজে সাদরে গৃহীত হয়েছে। তখনকার মুসলমান লেখকেরা যেখানে আরবি-ফার্সি শব্দের বহুল প্রয়োগে সাম্প্রদায়িক দোষে-দুষ্ট সাহিত্য সৃষ্টিতে মগ্ন, সেখানে মীর মশাররফ হোসেন রচনা করেছেন সর্বজনীন পরিশীলিত সাধু গদ্যের আবেগমাখা ভাষারীতি। বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> সাবেক এস্লামি ভাষা পরিত্যাগ করিয়া বিসুদ্ধ [বিশুদ্ধ] বাঙ্গালা ভাষার সেবা মুসলমান সমাজে আমিই প্রথম করিলাম। ...আমার মুখেই প্রথম 'ঈশ্বর' শব্দ বাহির হইয়াছে। এই প্রকার অনেক কথা – আমারই মুখে অগ্রে বাহির হইয়াছে, লিখা হইয়াছে – ছাপার অক্ষরে কেতাবে উঠিয়াছে। খোদা, এলাহি স্থানে জগদীশ-পরমেশ্বর, পানি স্থানে জল, নামাজ স্থানে উপাসনা – এইরূপ শব্দ বাহির হওয়ায় মুসলমান [সমাজে] আমার নিন্দার চর্চ্চ্যা [চর্চা] হইতে লাগিল। (আহসান, ১১ আগস্ট ২০১৬)

মীর মশাররফ হোসেন অসাম্প্রদায়িক ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা যেহেতু বাংলা, তাই সর্বস্তরে এ ভাষা প্রচলিত হওয়া জরুরি বলে তিনি মনে করতেন। বাংলা ভাষায় যারা আস্থা রাখতে পারে না, তারা মানুষ নামের কলঙ্ক। "আমাদের শিক্ষা" প্রবন্ধে তাঁর উচ্চারণ :

> বঙ্গবাসী মুসলমানদের দেশভাষা বা মাতৃভাষা "বাঙ্গালা"। মাতৃভাষায় যাহার আস্থা নাই, সে মানুষ নহে। বিশেষ সাংসারিক কাজকর্ম্মে মাতৃভাষারই সম্পূর্ণ অধিকার। মাতৃভাষায় অবহেলা করিয়া অন্য দুই ভাষায় বিখ্যাত পণ্ডিত হইলেও তাহার প্রতিপত্তি নাই। পরিবার, আত্মীয়স্বজন, এমনকি প্রাণের প্রাণ যে স্ত্রী, তাহার নিকটেও আদর নাই। অসুবিধাও বিস্তর। ইস্তক ঘরকন্নার কার্য্য নাগাদে রাজসংশ্রবী যাবতীয় কার্য্যে বঙ্গবাসী মুসলমানদের বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োজন। (মশাররফ, ১২৯৭)

পারিবারিক পরিসরেও মীর মশাররফ হোসেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি সন্তানদের নাম রেখেছেন বাংলা ভাষায়। তাঁর সন্তানদের নাম ছিল শরত, শিশির, সতী, সাবিত্রী, সত্যবান, কুকী, সুনীতি, সুমতি, রণজিত, সুধন্বা, ধর্মরাজ ও যুবরাজ। পুত্র-কন্যাদের এ ধরনের নাম রাখার কারণে রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে নিন্দা ও সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। *অপ্রকাশিত আত্মজীবনী*তে তিনি লিখেছেন :

> ...আকিকা হইল – নাম রাখিবার সময় উপস্থিত। নাম রাখা হইল মফাজ্জল হোসেন।...পারস্যভাষায় নাম রাখা হইল। আমি সদা সর্ব্বদা ডাকার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় নাম রাখিব।...দুই একজন বলিলেন বাঙ্গালা নাম রাখিবেন রাখুন, তাই বলিয়া রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, কালী নাম রাখা ভাল নয়। আমি বলিলাম – তাহাতে দোষ কি?...আপনারা এক চক্ষে দেখিবেন। কাযেই [কাজেই] বাঙ্গালা ভাষাটা আপনাদের চক্ষেই ধরে না। অথচ বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার বাতাস, বাঙ্গালার শস্য, বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার সকলই আপনার বলিতেছেন, ভাষাটার প্রতি এত ঘৃণার কারণ কি?...বাঙ্গালার মাটীতে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথম ডাক "মা" ডাকিতেছেন। কথা ফুটীয়ে বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতেছেন, অথচ সাহসের সঙ্গে বলছেন : "শরত্" নামেই আন্দোলন – মহা আন্দোলন, আমি তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলাম না। দমিলাম না। (আহসান, ১১ আগস্ট ২০১৬)

সাহিত্য-সাধনার শুরু থেকেই মীর মশাররফ হোসেনের উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো মুসলমান লেখক এত পরিচ্ছন্ন সাধু গদ্যরীতিতে সাহিত্য রচনা করতে পারে, তা সেকালের হিন্দুসমাজের বিদগ্ধজনেরা কল্পনাই করতে পারেননি। 'তিনি প্রথম আবির্ভাবেই নিজ রচনার গুণে হিন্দু-সমাজের কাছ থেকে মুসলমান লেখকের বাঙলা রচনার ক্ষমতা সম্পর্কে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিলেন।' (সুনীলকুমার, ১৯৭৬ : ৬৭) *বিষাদ-সিন্ধু* গ্রন্থের বিষয় মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে নেওয়া হলেও, ভাষারীতি এবং কাহিনি-বর্ণনার গুণে এটি সকল ধর্মের মানুষের কাছে সমাদৃত হয়েছে। মশাররফের অধিকাংশ গ্রন্থের ভাষারীতি সংস্কৃত শব্দবহুল অসাম্প্রদায়িক চেতনাজাত। ভাষাসৃষ্টির দক্ষতা এবং গদ্যশৈলীর অভিনবত্বে তিনি বিদ্যাসাগরের সমকক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

> বাংলাদেশে বাংলা-সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের দান সম্পর্কে যদি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা চলে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এক দিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে স্থান অন্যদিকে 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রণেতা মীর মশাররফ হোসেনের স্থান ঠিক অনুরূপ। (ব্রজেন্দ্রনাথ, ১৩৭৭ : ৪৮)

সাহিত্যের বিষয় নির্বাচন এবং চরিত্র রূপায়ণেও মীর মশাররফ হোসেন অসাম্প্রদায়িক ও উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। কোনো কোনো গ্রন্থের বিষয়বস্তু পুরোটাই নিয়েছেন হিন্দুসমাজ থেকে। তাঁর '*রত্নবতী*তে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তা মূলত হিন্দুজীবন। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র মুসলমানী ভাবধারা বা জীবন পরিচর্যার কোন চিহ্ন নাই।' (আউয়াল, ১৯৬৯ : ৩৭) এছাড়া *গাজী মিয়াঁর বস্তানী*, *উদাসীন পথিকের মনের কথা*, *বসন্তকুমারী*, *জমীদার দর্পণ* প্রভৃতি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের জীবনাবহ, রীতি-নীতি, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা। তাঁর শেষজীবনের কিছু রচনায় বিষয় নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে, তবে

সেগুলো সাহিত্যগুণে খুবই দুর্বল। কোনো বিশেষ সম্প্রদায় নয়, সামগ্রিকভাবে 'মানুষের জন্য আসাধারণ বেদনাবোধই মশাররফ হোসেনকে সাহিত্যিক হবার প্রেরণা যুগিয়েছিল।' (হাই, ১৩৬৬ : ১৮০) তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো ধর্মীয় বাতাবরণে আবদ্ধ নয়, তারা হিন্দু কিংবা মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করে না ; বরং তারা মানবিক বোধে উজ্জীবিত, দোষে-গুণে পরিপূর্ণ এক একটি চিরন্তন মানবীয় সত্তা। তাদের লোভ-লালসা আছে, কাম-ক্রোধ-মোহ আছে, আছে ঈর্ষা-হিংসা-দ্বেষ, আছে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতা। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা *বিষাদ-সিন্ধু*র মধ্যে ধর্মবুদ্ধি কিংবা ঐতিহাসিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেনি, এতে নিয়তি-তাড়িত মানব ভাগ্যের করুণ পরিণতিই মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একজন গবেষক বলেছেন : 'ধর্ম-নিরপেক্ষ সেই প্রবল মানবীয় চেতনাই মশাররফ হোসেনকে বিষাদ-সিন্ধু রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।' (আনিসুজ্জামান, ২০১৪ : ১৯৫)

ভারতবর্ষের সমাজে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ যুগ যুগ ধরে বিদ্যমান। এই বিরোধের সূত্রপাত মুসলমানদের বঙ্গবিজয়ের সময় থেকে। তারপর এ ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল একসঙ্গে বসবাস করেও দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একে অপরের প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাস-আস্থা অর্জন করতে পারেনি। এর পরিণামে বিভিন্ন সময় সংঘটিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও কলহ-বিবাদ। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী সুযোগ বুঝে এই বিবাদকে উস্কে দিয়েছে। মশাররফ-সমকালে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ মাঝে মাঝেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সেকালের সেই বিরোধ নিয়ে সর্বমহলে আলোচনা হয়েছে। এ সম্পর্কে "সৎ-প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে মশাররফ হোসেন লিখেছেন :

> "হিন্দু-মুসলমান বিবাদ" কথাটা লইয়া আজকাল সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে, প্রেরিত পত্রে, কবির কবিত্বে, লেখকের কলমে, বক্তার মুখে, খোশগল্পের আসরে, বৈঠকী কক্ষে, উকিল-মোক্তারগণের বিশ্রামাগারে, শিক্ষার্থীদের পাঠ মন্দিরে, বিদ্যালয়ে গুরু-শিষ্য সমাজে, বিবাহ মজলিসে, পূজার প্রাঙ্গণে প্রায় সকল স্থলেই–বড়ই আড়ম্বর চলিয়াছে। (মশাররফ, ১৯৮০ : ৫৬৪)

তাঁর অনেক রচনায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। *গাজী মিয়াঁর বস্তানী* এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন : 'হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাংলাদেশের কতকগুলো শাশ্বত ছবি *গাজী মিয়াঁর বস্তানী*তে আছে।' (হাই, ১৯৯৪ : ৫৯৪) এ গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমান চরিত্রের ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে এক ধর্মের প্রতি অন্যে ধর্মের মানুষের বিদ্বেষ তুলে ধরা হয়েছে। *টালা-অভিনয়* গ্রন্থে স্থান পেয়েছে সে যুগের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র। কলকাতার টালা অঞ্চলে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে জমিদার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একখণ্ড জমি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে যে সংঘর্ষ হয়েছিল, সেই বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে প্রহসনটি রচিত। মীর মশাররফ হোসেনের মতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের মূল 'রাজনৈতিক নয়, প্রধানত অর্থনৈতিক, অংশত

সামাজিক।' (আনিসুজ্জামান, ২০১৪ : ২০১) "সৎ-প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে তিনি এ বিবাদের যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাননি। সেজন্য তিনি প্রশ্ন করেছেন, পরাধীন জাতির বিবাদ কিসের? বিবাদের হেতুই বা কী? বলেছেন, খুবই ঠুনকো বিষয় নিয়ে এদের মধ্যে বিবাদ হয়। একের উন্নতিতে অন্যের ঈর্ষা, ঘৃণা – এসবই বিবাদের কারণ। এছাড়া কতকগুলো সামাজিক আচার-বিশ্বাস-সংস্কার এবং ধর্মীয় বিধান রয়েছে বিরোধের মূলে। হিন্দুরা কলাপাতার যেদিকে পরিশুদ্ধ মনে করে, মুসলমানরা তা ঘৃণা করে; হিন্দুরা উপাসনা করে শঙ্খ-কাঁসির ঘণ্টা বাজিয়ে আর মুসলমানরা আহ্বান জানায় আজানের মাধ্যমে। অনেক সময় গরু জবাইকে কেন্দ্র করেও বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। মীর মশাররফ হোসেন মনে করেন, যারা বিরোধ করে তারা প্রকৃত ধার্মিক নয়, কারণ 'খাঁটি হিন্দু মুসলমান দ্বারা কখনই ধর্মসম্বন্ধে, ঈশ্বর সম্বন্ধে বা জাতি সম্বন্ধে কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদ এ দেশে হয় না, হইবে না।' (মশাররফ, ১৯৮০ : ৫৬৭)

সমকালীন ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান একে অপরের সঙ্গে কীভাবে মিলেমিশে বসবাস করছে তার বহু দৃষ্টান্ত মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যে পাওয়া যায়। তিনি দেখেছেন যুগ যুগ ধরে ভারতের মুসলমানদের মহররমের তাজিয়া মিছিলে হিন্দুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেয় – মুসলমানরা যোগ দেয় হিন্দুদের দুর্গা পূজার উৎসবে। স্বজনের মৃত্যুতে একে অপরের সমব্যথী হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং নওয়াব আবদুল লতিফের মৃত্যুর পর উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই মর্মাহত হয়েছিল। মশাররফ হোসেনের সমকালে কুষ্টিয়ার এক হিন্দু মুন্সেফ মুসলমানদের ইবাদতের জন্য মসজিদ নির্মাণ করে দিয়েছিল। শাহজাদপুরের ঐতিহ্যবাহী মসজিদটি সংস্কারে হিন্দু-মুসলমান একপ্রাণ হয়ে কাজ করেছে। এভাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে মশাররফ দেখিয়েছেন, বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিবাদ, তা ধরতে গেলে কিছুই নয়। এ যেন ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া, আত্মীয়-স্বজনে কলহ, পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে মেয়েলি ঝগড়া, পাড়ায় পাড়ায় দলাদলি – এমনকী শাক্ত-বৈষ্ণব দ্বন্দ্বের মতোই ঠুনকো ব্যাপার। ব্যাপারটি ঠুনকো হলেও অনেক সময় কাটাকাটি-রক্তারক্তির পর্যায়ে চলে গেছে। সেজন্য তিনি এর প্রতিকার চেয়েছেন।

মশাররফ-চেতনায় প্রোথিত ছিল আবহমান বাঙালি-সমাজের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সমন্বয়ধর্মী চিন্তা-চেতনার ধারা। সে চেতনা থেকেই তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা করেছেন। *সঙ্গীত লহরী*, *উদাসীন পথিকের মনের কথা*, *টালা-অভিনয়*, *গো-জীবন* প্রভৃতি রচনায় তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আহ্বান জানিয়েছেন। *উদাসীন পথিকের মনের কথায়* হিন্দু-মুসলিম মিলনে উভয়ের ঐক্য কামনা করে লিখেছেন : 'হিন্দু-মুসলমানে এক ভাবা চাই। শত্রুতা বিনাশ করিতে একতা শিক্ষা করা চাই। একতাই সকল অস্ত্রের প্রধান অস্ত্র। জাতিভেদে হিংসা, জাতিভেদে ঘৃণা, দেশের মঙ্গলের জন্য একেবারে অন্তর হইতে চিরকালের

জন্য অন্তর করা চাই।' (মশাররফ, ১২৯৭ : ১২) *টালা-অভিনয়* প্রহসনে কালীঘাটের মন্দিরের বিদ্যারত্ন মহাশয় কালীর কাছে যে প্রার্থনা করেছে তাতে মশাররফের সমন্বয়ধর্মী ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে : 'মা! রক্ষা কর। ভারতের প্রতি সদয় হও। হিন্দু-মুসলমানে মনে মনে মিলন কর।' (মশাররফ, ১২৯৭ : ৫৪৪) এ গ্রন্থে বিধৃত কলকাতার মৌলা আলীর দরগায় হিন্দুস্থানী ব্যক্তির মোনাজাতের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা প্রকট হয়ে উঠেছে : 'এলাহি! হিন্দু-মুসলমান মিলন কর। উভয়ের মনের মলিনতা দূর কর। এলাহি, তাহাদের মায়া আমরা বুঝি, আমাদের মায়া মমতা তাহারা বুঝুক। উভয়ে এক হই – ধর্ম্মে ভিন্ন হউক, কর্ম্মে এক হওয়া চাই।' (মশাররফ, ১২৯৭ : ৫৪৩) তাঁর অসাম্প্রদায়িক ও সমন্বয়ধর্মী চেতনার শ্রেষ্ঠ ফসল "গো-জীবন" প্রবন্ধ। 'হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সাধনের জন্যে তাঁর আন্তরিক উদ্বেগ এ প্রবন্ধ রচনায় প্রেরণা দিয়েছে।' (আনিসুজ্জামান, ২০১৪ : ১৯০) এখানকার হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রত্যাশায় মীর মশাররফ হোসেন মুসলমানদের গরুর মাংস খাওয়া বন্ধের পরামর্শ দিয়েছেন :

> গো মাংস হালাল, খাইতে বাধা নাই।...কিন্তু শাস্ত্রে একথা লিখা নাই যে গোহাড় কামড়াইতেই হইবে, গোমাংস গলাধঃ করিতেই হইবে, না করিলে নরকে পচিতে হইবে।...এত উপকারী যে তার গলায় ছুরি দিতে মনে কি এতটুকু দয়ার সঞ্চার হয় না? উদর পরিপূর্ণ করিবার বিস্তর জিনিস আছে। নানাবিধ মাংস আছে, মৎস্য আছে, যত ইচ্ছা তত খাও, কিন্তু উপকারী পশুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিও না। (মশাররফ : ১২৯৫)

হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা গরুকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। ফলে গো-হত্যা রোধে তারা মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। মশাররফ হোসেন মনে করেন, বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যাই বেশি। তাই একে অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব না করে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করা উচিত। আর এজন্য প্রয়োজনে মুসলমানদের গো-মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। উভয় সম্প্রদায়ের মিলনাকাঙ্ক্ষী মশাররফ লিখেছেন :

> এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্ম্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্ম্মে এবং কর্ম্মে এক – সংসার কার্য্যে ভাই না বলিয়া থাকিতে পারি না। আপদে, বিপদে, সুখে দুঃখে, সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই।...এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গী যাহারা তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি? (মশাররফ : ১২৯৫)

হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সাধনে লেখনী ধারণ করায় মীর মশাররফ হোসেন স্বধর্মের মানুষের কাছে নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ীর সম্পাদনায় টাঙ্গাইলের *আহমদী* পত্রিকায় *গো-জীবনের* প্রথম প্রস্তাব "গোকুল নির্ম্মূল

আশংকা" ছাপা হলে সেখানকার *আখবারে এসলামিয়া* পত্রিকায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়, তাতে বলা হয়, মীর সাহেব মুসলমান নন। আনিসুজ্জামান লিখেছেন :

> এই উক্তির সমর্থনে আরো রচনা পত্রস্থ হয় এবং টাঙ্গাইলের সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলভী শফিউদ্দীনের বাসগৃহে ধর্মসভা অনুষ্ঠান করে লেখককে "কাফের" স্থির করা এবং তার স্ত্রী তালাক হবার ফতওয়া দেওয়া হয়। ক্ষুব্ধ মশাররফ হোসেন এঁদেরকে আদালতে অভিযুক্ত করেন এবং শেষ পর্যন্ত একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। (আনিসুজ্জামান, ২০১৪ : ১৯১)

মুসলমান সমাজের কাছে লাঞ্ছিত হয়েও তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি কামনায় আবিচল থেকেছেন। যুগের বৈরী পরিবেশে দাঁড়িয়ে তিনি অসাম্প্রদায়িক ও সমন্বয়ধর্মী চিন্তা-চেতনা প্রকাশে জোরালো ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি মনে-প্রাণে চেয়েছেন বাঙালি সমাজ থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূরীভূত হোক। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মিলেমিশে বসবাস করুক। অনেক সময় সমকালীন যুগের অনুদার পরিবেশে তাঁর অসাম্প্রদায়িক-ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তায় ফাটল ধরেছে। শেষ জীবনের কিছু কিছু রচনায় সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত মিললেও 'মশাররফ হোসেনের গৌরব এখানে যে তাঁর যা কিছু রচনা সাহিত্যপদবাচ্য, তা এই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবমুক্ত।' (আনিসুজ্জামান, ২০১৪ : ২০৬) বাঙালির সমাজ ও সাহিত্যে যুগ যুগ ধরে চলমান সমন্বয়ধর্মী, উদার এবং অসাম্প্রদায়িক ভাবধারার উজ্জ্বল প্রতিভূ তিনি। তাঁর জীবন-সাধনা ও সৃষ্টিকর্ম প্রধানভাবে বহন করছে শাশ্বত বাঙালির সমন্বয়ধর্মী জীবনবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভাবধারা। প্রধানভাবে তিনি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা, রক্ষণশীলতা এবং কূপমণ্ডূকতার ঊর্ধ্বে উঠে মানবিকতাকেই বড় করে দেখেছেন।

৫. উপসংহার

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালি সমাজে মীর মশাররফ হোসেন যে চেতনাধারা সঞ্চারিত করেছিলেন, তা সেযুগের হিন্দু-মুসলিম সমাজে ছিল আশা জাগানিয়া ব্যাপার। সুদূর অতীত থেকে বাঙালি চিত্তে বহমান প্রগতি এবং উদার-মানবিকবোধের ধারাটিই তিনি বেগবান করেছেন। পরবর্তীকালে সে ধারায় শক্তি সঞ্চার করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ মনীষী। সাম্প্রতিক পৃথিবীতে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে; তাতে চিরকালের বাঙালির উদার, অসাম্প্রদায়িক এবং সমন্বয়ধর্মী ধারা তথা মীর মশাররফ হোসেনের চিন্তাধারা প্রচার, প্রসার ও বেগবান হওয়া অত্যাবশ্যক। যুগজীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং তথ্যপ্রযুক্তির আশীর্বাদপুষ্ট সমাজ ও জীবনের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে সে চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে হবে সর্বত্র। নতুন প্রজন্ম এবং অনাগত কালের পাঠকের কাছে মীর মশাররফ হোসেনের উদার, মানবীয় গুণে ঋদ্ধ সাহিত্য-সম্ভার পৌঁছে দিতে হবে এবং তাদের চিত্তে সঞ্চারিত ও প্রোথিত করতে হবে তাঁর সমন্বয়ধর্মী, উদার ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভাব-সম্পদ।

গ্রন্থপঞ্জি

আনিসুজ্জামান (২০১৪)। *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, চারুলিপি, ঢাকা

আহমদ শরীফ (২০০৮)। *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৪০৮)। *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা

কাজী আবদুল ওদুদ (১৩৫৮)। *শাশ্বত-বঙ্গ*, কলিকাতা

গোলাম মুরশিদ (২০০৮)। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর, ঢাকা

দীনেশচন্দ্র সেন (১৯৯৬)। *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০২)। *কথাসাহিত্য পাঠ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৭৭)। *সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা* ২৮-২৯, কলিকাতা

মীর মশাররফ হোসেন (১২৯৭)। *উদাসীন পথিকের মনের কথা*, কুষ্টিয়া।

মীর মশাররফ হোসেন (১২৯৫)। গো-জীবন, টাঙ্গাইল

মীর মশাররফ হোসেন (১৯৮০)। টালা-অভিনয়, *মশাররফ রচনা-সম্ভার [সম্পা. কাজী আবদুল মান্নান]*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুনীর চৌধুরী (২০১৪)। *মীর-মানস*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৩৬৬)। *ভাষা ও সাহিত্য*, ইষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (১৩৭১)। *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, দ্বিতীয় খণ্ড, হাসি প্রকাশনালয়, ঢাকা

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল (১৯৬৯)। *রত্নবতী*, বইঘর, চট্টগ্রাম

সালাহ্উদ্দীন আহমদ (২০১৩)। *ইতিহাস ঐতিহ্য জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

স্বরোচিষ সরকার (২০১০)। বাংলা সাহিত্যে সংস্কার চেতনা মুসলমান সমাজ, শোভা প্রকাশ, ঢাকা

প্রবন্ধ

আবুল আহসান চৌধুরী (২০১৬)। সম্পাদক মীর মশাররফ হোসেন, কালি ও কলম [সম্পা. আবুল হাসনাত], কলকাতা

আবুল আহমান চৌধুরী (২০১৬)। বিষাদ-সিন্ধু : পাপ অথবা প্রেমের জয়-পরাজয়, *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ঢাকা

আবুল আহসান চৌধুরী (১১ আগস্ট, ২০১৬)। মীর মশাররফ হোসেন। *দৈনিক বণিক বার্তা*, ঢাকা

মীর মশাররফ হোসেন (১৫ পৌষ, ১২৯৭)। আমাদের শিক্ষা, পাক্ষিক *হিতকরী*, কলকাতা

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৭৬)। মীর মশাররফ হোসেন ও তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী, *সাহিত্য সমীক্ষা, ঢাকা*

মীর মশাররফ হোসেন (১৯৮০)। সৎ-প্রসঙ্গ, *মশাররফ রচনা-সম্ভার [সম্পা. কাজী আবদুল মান্নান]*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯৯৪)। গাজী মিয়াঁর বস্তানী : ভূমিকা, *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী ৩ [সম্পা.* হুমায়ূন আজাদ], বাংলা একাডেমি, ঢাকা